প্রাণীহত্যা ও বিবেকবোধ

উম্মে মুসলিমা

রমজান মাস আসছে কয়েক মাস পর এবং তার দু'মাস দশ দিন পর হবে কোরবানি ঈদ। গত বছরের 'তারা বাংলা' টিভিতে সুমন কবিরের 'লাইভ দশটায়' প্রোগ্রামের একদিনের মুক্ত আলোচনার বিষয়টি আমার এখন মনে পড়লো। ঐদিন 'গো-হত্যা কেন নিষিদ্ধ করা হবে' বিষয় নিয়ে সুমন বিজেপি নেতা তথাগত রায়ের সাথে বাক-বিতন্ডায় 'তারা' টিভি' সরগরম করেছিলেন। তথাগত রায় বারবার প্রতিবাদের সুরে বলছিলেন যে বাংলাদেশেও শুকর হত্যা নিষিদ্ধ। সুমন এ প্রতিবাদের পাল্টা জবাব দিতে পারছিলেন না কেননা বিষয়টি তার কাছে স্পষ্ট ছিল না। আসলে 'বাংলাদেশে শুকর হত্যা নিষিদ্ধ' বলে কোন আইন জারী হয়নি। কেননা গরুকে হিন্দুরা দেবতারূপে পুজো করলেও মুসলমানদের নিকট শুকর কোন পবিত্র প্রাণী নয়। তাই শুকর নিধন করলে মুসলমানদের অ-খুশি হওয়ার কিছুই নেই। বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিক এবং আদিবাসী-উপজাতীরা দিব্যি শুকর দিয়ে তাদের পুজো-পার্বণ সারছেন, বিয়ে-জন্মদিন-অন্নপ্রাশনে আকছার তারা শুকরের মাংস দিয়ে মহোৎসাহে ভুরিভোজ করছেন - এতে মুসলমানরা বাধা দেয়াতো দুরে থাক অনেকে তাদের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে (ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে কেবলমাত্র ঐ মাংস ভক্ষণ করা বাদে) সকল আনন্দে শরিক হচ্ছেন।

গো-হত্যা নিষিদ্ধকরণের পেছনে বিজেপি যে ক'টা যুক্তি খাড়া করেছে তার মধ্যে একটি অপ্রধান যুক্তি হচ্ছে গরু জবাই দৃশ্য দেখতে ভীষণ বিকট দেখায়। 'লাইভ দশটায়' অনুষ্ঠানে মারমুখী টেলিফোন-বক্তাদের কেউ কেউ আক্রমন করেছেন এভাবে যে প্রাণী হত্যা দৃশ্য যদি এতই হৃদয়বিদারক হয় তাহলে তা শুধু গো-হত্যা দৃশ্যের জন্যই প্রযোজ্য হবে কেন? ছাগল-শুকর-মহিষ-হাস-মুরগী-মাছরা কি অবলা প্রাণী নয়? তাদের হত্যা করা বা হত্যা-দৃশ্য দেখা কি খুব সুখকর? বিজেপি নেতা সদুত্তর দিতে পারেননি। প্রশ্ন হচ্ছে ধর্ম যা-ই বলুক প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে জীব হত্যা কি বিবেকবান কোমলপ্রাণ শিক্ষিত মানুষ কখনও উদারমনে মেনে নিতে পারে?

ঈদের পর কোথাও কোথাও মেইন রোডের পাশে ব্যানারে টাঙানো দুটো লাইনের একটি শ্লোগান কারো কারো হয়তো নজর কেড়েছে। শ্লোগানটি এরকম 'মনের পশুরে কর জবাই, পশুও বাঁচে বাঁচে সবাই'। সশিক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ বিবেকের দংশনেও জর্জরিত হচ্ছে। ধর্মের প্রচলিত অনুষ্ঠান পালনে বিবেকবান প্রজন্ম নিজের সাথেও প্রশ্নের সম্মুক্ষিন। কী নির্মমভাবে পশুদের হত্যা করা হয়! পশুর পা বেঁধে, তিনচারজন মিলে জোর করে চিৎ করে শুইয়ে চেপে ধরে অসহায় পশুর গলায় ধারালো ছুরি চালানো হয়। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখে। অনেক বাচ্চা এ ভয়াবহতায় চোখ ঢাকে। বিবেকহীন ধর্মান্ধ অভিভাবকরা আবার তাদের চোখ থেকে হাত সরিয়ে দেয়। বলে 'দেখ, দেখ, জবাই দৃশ্য দেখা ভালো। মন শক্ত হয়'। জবাই করা দেখে মন শক্ত করতে হবে কেন? তাহলে কি জবাই করা এবং জবাই দৃশ্য দেখিয়ে প্রকারান্তরে মুসলমানদের খুনের দীক্ষা দেয়া হচ্ছে?

কেউ কেউ পশু জবাইয়ের পর পাঞ্জাবি-পায়জামায় রক্তের ছিটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে একধরনের পৈশাচিক আনন্দ পান। অনেক বাচ্চা আবার ঐসব দেখে পশুর রক্তে আঙুল ডুবিয়ে নিজের কাপড়ে লাগিয়ে বড়দের অনুকরণ করে। আড়াই বছর বয়েসি এক শিশুকে তার বাবা ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কোরবানি ঈদে গরু জবাই দৃশ্য দেখানোর পর সে শিশুকে নিয়ে তারা এখন ডাক্তারের কাছে ছুটাছুটি করছেন। কেন? না, শিশুটি ঐ দৃশ্য দেখার পর থেকে রাতে ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে কেঁদে উঠছে আর 'আমার গরু মারলে কেন' বলে অবিরাম কান্না জুড়ে দিচ্ছে। এক

কিশোরি তার বাবাকে কোরবানির গরু কিনতে যাওয়ার সময় ‘বাবু গরু’ (বাচ্চা গরু) আনতে নিষেধ করে। গতবার কোরবানির সময় একটা বাচ্চাগরুর ছলছল চোখ সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

আমরা কোরবানির ঈদে পশু জবাই-এর প্রেক্ষাপট হিসেবে আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে উলেখিত হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর পুত্র হত্যা করতে যাওয়ার ঘটনাটি জানতে পারি। স্বপড়বাদেশপ্রাপ্ত হয়ে হযরত তার সর্বাপেক্ষা প্রিয় জিনিষটি কোরবানি করতে উদ্যত হন। কিন্তু এর পিছনেই বা কারণ কি? মানুষের সামাজিক ইতিহাস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় মানুষ সভ্য হওয়ার আগে নরবলির বিষয়টি সব সমাজেই ছিল। এমনকি এখনও কোন কোন কুসংস্কারাচ্ছনড়ব শিক্ষার আলো বঞ্চিত সমাজে নরবলি/পুত্রবলির ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। হযরত ইব্রাহিমের সময়কালে সমাজে নরবলি প্রথা থাকতেই পারে। কেননা একটি সমাজ যখন নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্তে পৌঁছতো তখনই ঈশ্বর মানুষকে রক্ষার জন্য নবী/রসুল/মহামানব প্রেরণ করতেন। এ নৃশংসতা থেকে অসহায় মানুষ এবং সমাজকে রক্ষা করার জন্যই হযরত ইব্রাহিমের কোমল প্রাণ কাঁদতো এবং তিনি ঈশ্বরের কাছে এ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই প্রার্থনা করেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বপড়বাদেশপ্রাপ্ত হয়েই তিনি পশুহত্যার প্রচলন শুরু করেন। সেসময় পশুহত্যার উদ্ভাবন নরবলির মত ভয়াবহ সামাজিক প্রথাকে রুখতে সমর্থ হয়েছিল। তাই আজ যে সম্প্রদায় সেই ঘটনাকে স্মরণ করে পশুহত্যায় অনুপ্রাণিত তাদেরকে এটাও মনে রাখতে হবে হযরত ইব্রাহিম কিন্তু লোকালয়ে জনসম্মুখে জবাই-এর ঘটনাটি ঘটাননি। এ কাজে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জন স্থান তিনি বেছে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আমাদের মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ আঃ)-এর সামাজিক সংস্কারের ফলে আইয়ামে জাহেলিয়ায় মেয়েশিশু জীবন্ত কবর দেয়ার প্রথাও লোপ পেয়েছিল।

অধ্যাপক আবদুলাহ আবু সাঈদ কোন ছাউনি দিয়ে ঘেরা নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাই-এর পরামর্শ দিয়েছেন। উনড়বত বিশ্বে কোথাও উন্মুক্ত স্থানে পশু হত্যার নজির নেই। সেখানে শহর থেকে দুরে পশুর মাংস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কারখানার মধ্যে পশুদের নিয়ে যাওয়া হয়। এমনকি যারা পশু কাটার মেশিন চালানোর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন তারাও সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন না। হত্যাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করার প্রভাব যেমন কচিমনকে আলোড়িত করে তেমনি বিবেকবান কোমলপ্রাণ মানুষও কেবল সামাজিকভাবে মিলেমিশে বসবাসের জন্যে স্পর্শকাতর ধর্মীয় বিষয়কে ইচ্ছের বিরুদ্ধে মেনে নিতে বাধ্য হন। পশু স্বহস্তে জবাই করা বা প্রত্যক্ষ করলেই যে সবাই জবাইয়ে পারদর্শী হয়ে উঠবে তা নয়, তবে তা যদি কারো ধর্মীয় উন্মাদনাকে উৎসাহিত করে (কোন একটি মৌলবাদী সংগঠন তাদের শত্রুদের হাতপায়ের রগ কেটে দিতে সিদ্ধহস্ত) এবং খোলা জায়গায় পশুহত্যার প্রভাবে কেউ যদি জবাইয়ের সংস্কৃতিতে ছিটেফোটাও উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ে (সংবাদপত্রে জবাই করে হত্যার খবরও প্রায়শই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়) তা কি পরোক্ষভাবেও আমাদের মহান কোরবানির আদর্শ (পশুসত্ত্বার হত্যা, যা একটি প্রতিক বই আর কিছুই নয়) কে ভূলুণ্ঠিত করবে না?

যদিও কোরবানির পশুকে অনেক সম্মানের সাথে, অনেক পবিত্র আবেষ্টনিতে, অনেক যতেড়বর সাথে জবাই করা হয়, কিন্তু হত্যা হত্যা-ই। ছুরি, রক্ত, আর্তনাদ - এগুলোর কোনটিই কি খুব আনন্দদায়ক শব্দ? বিজেপি নেতা নৃশংস দৃশ্য না দেখার জন্য আইন জারীর কথা বলেন। অথচ উনি কি অমানবিকভাবে পাঠা বলি দেখেন না? একবার দূরদর্শনে পাঠাবলির করুণ দৃশ্য দেখে অনেক কোমলপ্রাণ দর্শক শিউরে উঠেছিল। দেবী দূর্গাকে সামনে রেখে, তাকে খুশি করার জন্য একের পর এক খড়গ দিয়ে এককোপে ছাগলগুলোর মাথা ধড় থেকে আলাদা করে দুরের উস্মত্ত জনতার মাঝে ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছিল।

মুন্ডুবিহীন প্রানীগুলো থেতলে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুধার্ত জনতার

মাঝে পড়ছিল। এ নৃশংসতার কী জবাব দেবে বিজেপি? কোরিয়ান না কি থাই কাদের কাছে যেন জীবন্ত বানরের মাথার খুলি ধারালো ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলে ভেতরের মগজ খাওয়া মহানন্দের ব্যাপার। হরিনের মত সৌন্দর্যের প্রতীককেও আমরা তারিয়ে তারিয়ে খাই, উটের মত বিশাল নিরীহ উপকারী জীবকে বুড়ো হয়ে গেলেও রেহাই দিই না। কোথায় না নৃশংসতা নেই? পশুজগতে 'সারভাইভাল অব দ্যা ফিটেষ্ট' নীতিতে বড় ও শক্তিশালী প্রাণীরা ছোট ও শক্তিহীনদের খেয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখলেও তা কি মানুষের মত বুদ্ধি বিবেকবান প্রানীদের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে?

প্রশড়ব উঠতে পারে তাহলে আমিষের চাহিদা পুরণ করবো আমরা কী দিয়ে? তাছাড়া, এসব মাংস রসনাকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে এ থেকে নিজকে নিরস্ত করাও কঠিন। আর ধর্মাচার এমন একটা জিনিষ যা বিবেকের দংশনকে অস্বীকার করার মত ক্ষমতার অধিকারী। যেমন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে অনেক দায়িত্ববান ধর্মভীরু (ধর্মান্ধ?) কর্মকর্তা/কর্মচারী বছরে তিন/চার মাস 'চিলা'র জন্য অফিসে অনুপস্থিত থাকেন। যেখানে সাধারণ কর্মজীবীরা অনিবার্যকারণে একসাথে ছ'সাতদিনের বেশি নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করলে অনেকক্ষেত্রে সেটা অর্জিত ছুটি হিসেবে দরখাস্ত করার জন্য চাপ দেয়া হয় সেখানে কেবল ধর্মাচারের জন্য মাসের পর মাস অনুপস্থিত থাকলেও তাদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তারা তাদের একবার সবিনয়ে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করার বিবেক-বল পান না 'এটাকে কোন ছুটির আওতায় ফেলতে পারি'? তাই যদ্দিন না ধর্ম আর বিবেকের সহাবস্থান সম্পনড়ব হচ্ছে তদ্দিন নিদেন পক্ষে লোকচক্ষুর আড়ালে প্রাণীহত্যার বিষয়টি নিষ্পনড়ব হলে অনেক প্রশড়ব ও অপ্রীতিকর অবস্থা এড়ানো সম্ভব হতে পারে। কেননা প্রানীহত্যার পর উন্মুক্ত রাস্তাঘাটে, মাঠেময়দানে, আবাসিক এলাকার বাসাবাড়ির সামনে রক্ত-হাড়গোড়-ময়লার যে দূষণ পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে সেটাও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিসরুপ।

চামড়া শিল্পের বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। শ্রম বাজার, বৈদেশিক বাজার, অর্থনীতির একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে চামড়া। প্রাচীনকালে মানুষের খাদ্যের বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে চামড়া মানুষের শীত ও লজ্জা নিবারণ করেছে। আমরা আধুনিক কালের মানুষ। সমসৌন্দর্যের কৃত্রিম পন্য উৎপাদনে আমরা পারদর্শী। আমরা মানবিক। 'ফার' (পশুর পশম) -এর কোট পরা বর্জন করা নিয়ে আধূনিক ছেলেমেয়েরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। পশুর গা থেকে পশম চেঁছে নিয়ে মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধির অমানবিকতায় আজকের প্রজন্ম বিক্ষুব্ধ। এমনকি ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং (ভিপি সিং)-এর ব্যবহৃত টুপি নিয়েও কম বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি। তাঁর টুপিতে ব্যবহৃত পশমের আবরণটি নাকি কঁচি পাঠা/মেষ-এর পশমে তৈরী হতো। যার জন্য ঐসব বাচ্চা পশুকে কেবল ঐ টুপি তৈরীর উপাদান সংগ্রহের জন্যই হত্যা করা হতো। মানুষের মানসিকতা, সৌন্দর্যচেতনা ও রুচিবোধ পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশ্ববাজার অর্থনীতির দিক্ও স্বয়ংক্রিয়ভাবেই পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। একদিন মনে হতো পলিথিন ব্যাগ ছাড়া আমাদের জীবন বুঝি অচল। অথচ আজ পৃথিবীকে, পরিবেশকে বাঁচাতে আমরাই তা বর্জন করেছি।

দীর্ঘায়ু লাভ করার জন্য যুগে যুগে বিজ্ঞানীরা মানুষের খাদ্যাভাস পরিবর্তনের উপদেশ দিয়ে আসছেন। আজ বলছেন রেড মিট শরীরের জন্য হুমকিসরূপ, কাল বলছেন না, কোন অসুবিধা নেই। আজ বলছেন কার্বোহাইড্রেড গ্রহণ কমাতে হবে, তো কাল বলছেন, যত ইচ্ছে খাও। তবে যে উপদেশটি আজ পর্যন্ত বিতর্ক সৃষ্টি করেনি তা হচ্ছে 'শাক সবজি খাওয়া শরীরের জন্য সব'চে উপকারি এবং দীর্ঘজীবী হওয়ার জন্য সব'চে উপযোগী'। জাপানীদের দীর্ঘায়ুর পেছনের কারণ নাকি এটাই। এছাড়া হাঁস-মুরগী ও মাছ হত্যা প্রাণী হত্যার বিতর্কের মধ্যে পড়ে বলে মনে হয় না।

তাই ডিম-দুধ-ডাল-মাছ-মুরগীতেই যদি আমিষের চাহিদা পূরণ হয় তাহলে আর আলোচিত প্রানী হত্যা করার দরকার কি? মানুষ অভ্যাসের দাস। আজ আমরা এধরনের আহার-সংস্কৃতি শুরু করলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হয়তো একদিন প্রাণীহত্যার বিষয়টি ইতিহাসের একটি করুণ অধ্যায় হিসেবে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হবে। অপরদিকে নৃশংসতা থেকে অসহায় পশুরা মুক্তি লাভ করবে এবং সেইসাথে সর্বধর্মীয় মানুষ প্রাণীহত্যার রাজনীতির গ্যাড়াকলে না পড়ে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির সেতুবন্ধন রচনা করতে সক্ষম হবে।